বাংলায় তুর্কি আক্রমণ ও তার প্রভাব

বি.এ (পার্ট ১)

ক্লাস, ২২/০২/১৯

বাপ্পাদিত্য মুখোপাধ্যায়

বারোশ' শতাব্দীর প্রারম্ভে তুর্কি বীর মুহম্মদ বিন বখতিয়ার উদ্দিন খিলজি বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। তখন লক্ষ্মণ সেনের শাসন চলছিলো। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার উদ্দিন খিলজি ছিলেন জাতিতে তুর্কি এবং বৃত্তিতে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। তিনি ছিলেন আফগানিস্তানের গরমশির বা আধুনিক দশতই মার্গের অধিবাসী। অতিব দারিদ্র্য বখতিয়ার স্বীয় কর্মশক্তির ওপর নির্ভর করে ভাগ্যান্বেষণে বের হয়ে পড়েন। প্রথমে তিনি সুলতান ঘোরীর সৈন্য বিভাগে চাকরির জন্য আবেদন করেন, কিন্তু তার শারীরিক ত্রুটির কারণে তিনি সেখানে চাকরি লাভে ব্যর্থ হন। দেহের তুলনায় তার হাত বেশ বড় ছিল। গজনীতে ব্যর্থ হয়ে তিনি দিল্লীর শাসনকর্তা কুতুবুদ্দীনের দরবারে হাজির হন। এখানেও তিনি চাকরি লাভে ব্যর্থ হন। অতঃপর তিনি বদাউনে যান এবং সেখানকার শাসনকর্তা মালিক হিজবর উদ্দীন বখতিয়ারকে নগদ বেতনে চাকরিতে ভর্তি করেন। কিছুদিন পরে তিনি বদাউন ত্যাগ করে অযোধ্যায় গমন করেন। অযোধ্যার শাসনকর্তা হুশামউদ্দীন তাকে দুটি পরগনার জায়গীর প্রদান করেন। এখানেই বখতিয়ার তার ভবিষ্যৎ উন্নতির উৎস খুঁজে পান।

বখতিয়ার অল্পসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে তার পরগনার পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজ্য আক্রমণ করেন। এ সময় তার বীরত্বের কাহিনী সবদিকে ছড়িয়ে পড়লে দলে দলে ভাগ্যান্বেষী মুসলমান তার সৈন্যদলে যোগদান করেন। ফলে বখতিয়ারের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অতঃপর তিনি বিনাবাধায় এক বৌদ্ধবিহার জয় করেন। এটি ছিল ওদন্ত বিহার, যা পরে বিহার নামেই পরিচিতি লাভ করে। বিহার জয়ের পরে আরো অধিকসংখ্যক

সৈন্য সংগ্রহ করে বখতিয়ার নদীয়া আক্রমণ করেন। এ সময় বাংলাদেশের রাজা লক্ষ্মণ সেন রাজধানী নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন।
নদীয়া অভিযানকালে বখতিয়ার ঝাড়খন্ড অরণ্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে এত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়েছিলেন যে, যখন তিনি নদীয়ায় পৌঁছেন তখন মাত্র ১৮ মতান্তরে ১৭ জন অশ্বারোহী তার সঙ্গে ছিলেন, বাকি মূল বাহিনী পিছনে ছিল। বখতিয়ার সরাসরি লক্ষ্মণ সেনের প্রাসাদদ্বারে হাজির হন এবং রক্ষীদের হত্যা করেন।
তার আগমনে শহরে শোরগোল পড়ে যায়। এ সময় মধ্যাহ্নভোজে ব্যস্ত রাজা লক্ষ্মণ সেন মুসলমান অভিযানের খবর পেয়ে পশ্চাৎদ্বার দিয়ে

পালিয়ে নৌপথে বিক্রমপুরে গিয়ে আশ্রয় নেন। পূর্বেই দৈবজ্ঞ, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণগণ লক্ষ্মণ সেনকে এই বলে রাজধানী ত্যাগ করতে অনুরোধ করেছিলেন যে তাদের শাস্ত্রে তুরস্ক সেনা কর্তৃক বঙ্গ জয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে এবং বিজয়ের বর্ণনা শাস্ত্রে আছে। কিন্তু রাজা লক্ষ্মণ সেন তাদের কথা আমলে না নিয়ে নদীয়ায় থেকে যান। তিনি নদীয়া আক্রমণের স্বাভাবিক পথগুলো রুদ্ধ করে দিয়ে মোটামুটি নিশ্চিন্তায় নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন।

বখতিয়ার তিনদিন ধরে নদীয়া লুট করেন এবং প্রচুর ধনসম্পদ হস্তগত করেন। অতঃপর তিনি নদীয়া ত্যাগ করে লক্ষ্মণাবতীর (গৌড়) দিকে যান। তিনি লক্ষ্মণাবতী অধিকার করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। গৌড় জয়ের পর তিনি আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে বরেন্দ্র বা উত্তর বাংলায় নিজ অধিকার বিস্তার করেন।
বখতিয়ার নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যে সুশাসনের ব্যবস্থা করেন। তিনি অধিকৃত এলাকাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগে একজন সেনাপতিকে শাসনভার অর্পণ করেন।
তুর্কিস্তানের সাথে সোজা যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি তিব্বত আক্রমণ করতে প্রয়াসী হন এবং আক্রমণের সব পথঘাটের খোঁজখবর সংগ্রহ করেন। সব প্রস্তুতি গ্রহণ করে তিনি ১০ হাজার সৈন্যসহ লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করেন। উত্তর-পূর্বদিকে কয়েকদিন চলবার পর তারা বর্ধন কোট নামক শহরে পৌঁছেন। এই শহরের পূর্বদিকে বেগমতি নামক গঙ্গা নদীর তিনগুণ বড় একটি নদী ছিল। বখতিয়ার নদী অতিক্রম না

করে উত্তরদিকে অগ্রসর হতে থাকেন এবং দশদিন চলার পর একটি পাথরের সেতুর কাছে আসেন। সেতু পার হয়ে তিনি তার দুইজন সেনাপতিকে সেতু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। এ সময় কামরূপরাজ তাকে এ সময় তিব্বত আক্রমণ না করে ফিরে যেতে পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন, পরের বছর আবার এলে তিনিও তাকে এ আক্রমণে সাহায্য করবেন।
কিন্তু বখতিয়ার সে কথায় কর্ণপাত না করে উত্তরদিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ১৫ দিন চলার পরে বখতিয়ার শস্য-শ্যামলা এক স্থানে পৌঁছেন। ঐ স্থানে স্থানীয় সৈন্যরা বখতিয়ারের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বখতিয়ার যুদ্ধে জয় লাভ করলেও তার প্রচুর সৈন্য নিহত হয়। বন্দী শত্রু সৈন্যদের কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন, ঐ স্থানের অদূরে করমবত্তন শহরে লাখো সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। এ কথা শুনে বখতিয়ার আর সামনে না অগ্রসর হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। ফেরার পথে তার সৈন্য দল অসীম কষ্টের মধ্যে নিপতিত হয়। অনেক কষ্টের পর পাথরের সেতুর কাছে পৌঁছে বখতিয়ার দেখতে পেলেন, সেতুটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। পার্বত্য লোকেরা চারদিক থেকে তার সৈন্য দলের ওপর আক্রমণ চালায়। অবশেষে মরিয়া হয়ে বখতিয়ার সসৈন্যে সাঁতার কেটে নদী পার হন। বখতিয়ারের বিরাট সৈন্য বাহিনী সেখানে ধ্বংস হলো। আর এভাবেই বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রতিষ্ঠাতা দুর্দম্য সাহসী বীরের তিব্বত অভিযান ব্যর্থ হয়। অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে তিনি দেব কোটে ফিরে আসেন। দেব কোটে অবস্থানকালে তিনি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। বিপুল সৈন্য বাহিনী ধ্বংস হওয়ার শোকে ও ব্যর্থতায় তিনি ভেঙে পড়েন। শয্যাশায়ী অবস্থায় ১২০৬ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। বখতিয়ারের এই ব্যর্থতা ও তার সৈন্য বাহিনী ধ্বংস বাংলার মুসলমান শাসনের ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বখতিয়ার নিজ ক্ষমতা ও সাহসিকতার ফলে সুদূর আফগানিস্তান থেকে এসে বাংলাদেশে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে তার স্বল্পকালীন শাসন নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিল।

প্রভাব

এই সময় বাংলা সাহিত্যে যা সৃষ্টি হয়েছিল তা ধংশ হয়ে যায় বা ধংশ করে দেওয়া হয়। কবিরা তাদের রচনা এমন ভাবে লুকিয়ে ফেলেন যা আজও খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। তুর্কি আক্রমনের জন্য ১২০১-১৩৫০ অন্ধকার যুগে বা বন্ধা যুগে পরিনত হয়েছে।